গল্প

লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM 2021

লালু ১

ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল তার নাম লালু। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে—অর্থাৎ, সে এতকাল পূর্বে যে, তোমরা ঠিকমত ধারণা করতে পারবে না—আমরা একটি ছোট বাঙলা ইস্কুলের এক ক্লাসে পড়তাম। আমাদের বয়স তখন দশ-এগারো। মানুষকে ভয় দেখাবার, জব্দ করবার কত কৌশলই যে তার মাথায় ছিল তার ঠিকানা নেই। ওর মাকে রবারের সাপ দেখিয়ে একবার এমন বিপদে ফেলেছিল যে, তিনি পা মচ্‌কে প্রায় সাত-আটদিন খুঁড়িয়ে চলতেন। তিনি রাগ করে বললেন—ওর একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে। সন্ধ্যেবেলায় এসে পড়াতে বসবেন, ও আর উপদ্রব করবার সময় পাবে না।

শুনে লালুর বাবা বললেন, না। তাঁর নিজের কখনো মাস্টার ছিল না, নিজের চেষ্টায় অনেক দুঃখ সয়ে লেখাপড়া করে এখন তিনি একজন বড় উকিল। ইচ্ছে ছিল, ছেলেও যেন তেমনি করেই বিদ্যা লাভ করে। কিন্তু শর্ত হলো এই যে, যে-বার লালু ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম না হতে পারবে তখন থেকে থাকবে ওর বাড়িতে পড়ানোর টিউটার। সে যাত্রা লালু পরিত্রাণ পেলে, কিন্তু মনে মনে রইল ও মা'র 'পরে চটে। কারণ, উনি তার ঘাড়ে মাস্টার চাপানোর চেষ্টায় ছিলেন। সে জানত বাড়িতে মাস্টার ডেকে আনা আর পুলিশ ডেকে আনা সমান।

লালুর বাপ ধনী গৃহস্থ। বছর কয়েক হলো পুরানো বাড়ি ভেঙ্গে তেতলা বাড়ি করেছেন; সেই অবধি লালুর মায়ের আশা গুরুদেবকে এ-বাড়িতে এনে তাঁর পায়ের ধুলো নেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, ফরিদপুর থেকে এতদূরে আসতে রাজী হন না, কিন্তু এইবার সেই সুযোগ ঘটেছে। স্মৃতিরত্ন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশী এসেছেন, সেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছেন—ফেরবার পথে নন্দরানীকে আশীর্বাদ করে যাবেন। লালুর মা'র আনন্দ ধরে না—উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত—এতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, গুরুদেবের পায়ের ধুলো পড়বে। বাড়িটা পবিত্র হয়ে যাবে।

নীচের বড় ঘরটা থেকে আসবাবপত্র সরানো হলো, নতুন ফিতের খাট, নতুন শয্যা তৈরি হয়ে এলো,—গুরুদেব শোবেন। এই ঘরেরই এক কোণে তাঁর পূজো-আহ্নিকের জায়গা হলো, কারণ তেতলার ঠাকুরঘরে উঠতে নামতে তাঁর কষ্ট হবে।

দিন-কয়েক পরে গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কি দুর্যোগ! আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘটা, যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি—তার আর বিরাম নেই।

এদিকে মিষ্টান্নাদি তৈরি করতে, ফল-ফুল সাজাতে লালুর মা নিঃশ্বাস নেবার সময় পান না। তারই মধ্যে স্বহস্তে ঝেড়েঝুড়ে মশারি গুঁজে দিয়ে বিছানা করে গেলেন। নানা কথাবার্তায় রাত হয়ে গেল, পথশ্রমে ক্লান্ত গুরুদেব আহারাদি সেরে শয্যা গ্রহণ করলেন। চাকর-বাকর ছুটি পেলে। সুকোমল শয্যার পারিপাট্যে প্রসন্ন গুরুদেব মনে মনে নন্দরানীকে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছাদ চুঁইয়ে মশারি ফুঁড়ে তাঁর সুপরিপুষ্ট পেটের উপর জল পড়চে।—উঃ, কি ঠাণ্ডা সে জল! শশব্যস্তে বিছানার বাইরে এসে পেটটা মুছে ফেললেন, বললেন, নতুন বাড়ি করলে নন্দরানী, কিন্তু পশ্চিমের কড়া রোদে ছাতটা এর মধ্যেই ফেটেচে দেখচি। ফিতের খাট, ভারী নয়, মশারি-সুদ্ধ সেটা ঘরের আর একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আধ মিনিটের বেশি নয়, চোখ দুটি সবে বুজেছেন, অমনি দু-চার ফোঁটা তেমনি ঠাণ্ডা জল টপটপ টপটপ কর পেটের ঠিক সেই স্থানটির উপরেই ঝরে পড়ল। স্মৃতিরত্ন আবার উঠলেন, আবার খাট টেনে অন্যধারে নিয়ে গেলেন, বললেন, ইঃ—ছাতটা দেখচি এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত ফেটে গেছে। আবার শুলেন, আবার পেটের উপর জল ঝরে পড়ল। আবার উঠে পেটের জল মুছে খাটটা টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু শোবামাত্রই তেমনি জলের ফোঁটা। আবার টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু সেখানেও তেমনি। এবার দেখলেন বিছানাটাও ভিজেছে, শোবার জো নেই। স্মৃতিরত্ন বিপদে পড়লেন। বুড়ো-মানুষ; অজানা জায়গায় দোর খুলে বাইরে যেতেও ভয় করে, আবার থাকাও বিপজ্জনক। কি

জানি ফাটা ছাত ভেঙ্গে হঠাৎ মাথায় যদি পড়ে! ভয়ে ভয়ে দোর খুলে বারান্দায় এলেন, সেখানে লণ্ঠন একটা জ্বলচে বটে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই,—ঘোর অন্ধকার।

যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়ো হাওয়া! দাঁড়াবার জো কি! কোথায় চাকর-বাকর, কোন্ ঘরে শোয় তারা—কিছুই জানেন না তিনি। চেঁচিয়ে ডাকলেন, কিন্তু কারও সাড়া মিলল না। একধারে একটা বেঞ্চি ছিল, লালুর বাবার গরীব মক্কেল যারা, তাহারই এসে বসে। গুরুদেব অগত্যা তাতেই বসলেন। আত্মমর্যাদার যথেষ্ট লাঘব হলো; অন্তরে অনুভব করলেন, কিন্তু উপায় কি! উত্তরে বাতাসে বৃষ্টির ছাঁটের আমেজ রয়েছে—শীতে গা শিরশির করে—কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, পা দুটি যথাসম্ভব উপরে তুলে, যথাসম্ভব আরাম পাবার আয়োজন করে নিলেন। নানাবিধ শ্রান্তি ও দুর্বিপাকে দেহ অবশ, মন তিক্ত, ঘুমে চোখের পাতা ভারাতুর, অনভ্যস্ত গুরু-ভোজন ও রাত্রি-জাগরণে দু-একটা অম্ল উদগারের আভাস দিলে—উদ্বেগের অবধি রইল না। হঠাৎ এমনি সময় অভাবনীয় নতুন উপদ্রব। পশ্চিমের বড় বড় মশা দুই কানের পাশে এসে গান জুড়ে দিলে। চোখের পাতা প্রথমে সাড়া দিতে চায় না, কিন্তু মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কি জানি এরা সংখ্যায় কত। মাত্র মিনিট-দুই—অনিশ্চিত নিশ্চিত হলো; গুরুদেব বুঝলেন সংখ্যায় এরা অগণিত। সে বাহিনীকে উপেক্ষা করে বিশ্বে এমন বীরপুরুষ কেউ নেই। যেমন তার জ্বলুনি তেমনি তার চুলকুনি। স্মৃতিরত্ন দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন, কিন্তু তারা সঙ্গ নিলে। ঘরের মধ্যে জলের জন্য যেমন, ঘরের বাইরে মশার জন্য তেমন। হাত-পায়ের নিরন্তর আক্ষেপে, গামছার সঘন সঞ্চালনে কিছুতেই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না। স্মৃতিরত্ন এ-পাশ থেকে ও-পাশে ছুটে বেড়াতে লাগলেন, শীতের মধ্যেও তাঁর গায়ে ঘাম দিলে। ইচ্ছে হলো ডাক ছেড়ে চেঁচান, কিন্তু নিতান্ত বালকোচিত হবে ভেবে বিরত রইলেন। কল্পনায় দেখলেন নন্দরানী সুকোমল শয্যায় মশারির মধ্যে আরামে নিদ্রিত, বাড়ির যে সেখানে আছে পরম নিশ্চিন্তে সুপ্ত—শুধু তাঁর ছুটোছুটিরই বিরাম নেই। কোথাকার ঘড়িতে চারটে বাজলো, বললেন, কামড়া ব্যাটারা যত পারিস, কামড়া,—আমি আর পারিনে।—বলেই বারান্দায় একটা কোণে পিঠের দিকটা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, সকাল পর্যন্ত যদি প্রাণটা থাকে ত এ দুর্ভাগা দেশে আর না।

যে গাড়ি প্রথমে পাব সেই গাড়িতে দেশে পালাব। কেন যে এখানে আসতে মন চাইত না তার হেতু বোঝা গেল। দেখতে দেখতে সর্বসন্তাপহর নিদ্রায় তাঁর সারারাত্রির সকল দুঃখ মুছে দিলে—স্মৃতিরত্ন অচেতনপ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে নন্দরানী ভোর না হতেই উঠেছেন,—গুরুদেবের পরিচর্যায় লাগতে হবে। রাত্রে গুরুদেব জলযোগ মাত্র করেছেন—যদিচ তা গুরুতর—তবু মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, খাওয়া তেমন ভাল হয় নাই। আজ দিনের বেলা নানা উপচারে তা ভরিয়ে তুলতে হবে।

নীচে নেমে এলেন, দেখেন দোর খোলা। গুরুদেব তাঁর আগে উঠেছেন ভেবে একটু লজ্জা বোধ হলো। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন তিনি নেই, কিন্তু এ কি ব্যাপার! দক্ষিণ দিকের খাট উত্তর দিকে, তাঁর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা জানালা ছেড়ে মাঝখানে নেমেচে, কোষাকুষি, আসন প্রভৃতি পূজা-আহ্নিকের জিনিসপত্রগুলো সব এলোমেলো স্থানভ্রষ্ট,—কারণ কিছুই বুঝলেন না। বাইরে এসে চাকরদের ডাকলেন, তারা কেউ তখনও ওঠেনি। তবে একলা গুরুদেব গেলেন কোথায়? হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল—ওটা কি? এক কোণে আলো-অন্ধকারে মানুষের মত কি একটা বসে না! সাহসে ভর করে একটু কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন তাঁর গুরুদেব। অব্যক্ত আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠাকুরমশাই! ঠাকুরমশাই!

ঘুম ভেঙ্গে স্মৃতিরত্ন চোখ মেলে চাইলেন, তার পরে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। নন্দরানী ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরমশাই, আপনি এখানে কেন?

স্মৃতিরত্ন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সারা রাত দুঃখের আর পার ছিল না যে মা!

কেন বাবা?

নতুন বাড়ি করেচ বটে মা, কিন্তু ছাত কোথাও আর আস্ত নেই। সারা রাতের বৃষ্টি-বাদল বাইরে ত পড়েনি, পড়েচে আমার গায়ের উপর। খাট টেনে যেখানে নিয়ে যাই সেখানেই পড়ে জল। পাছে ছাত ভেঙ্গে মাথায় পড়ে পালিয়ে এলাম বাইরে, কিন্তু তাতেই কি রক্ষে আছে মা, পঙ্গপালের মত ডাঁশ-মশা ঝাঁকে ঝাঁকে সমস্ত রাত্রি যেন ছুবলে খেয়েছে,—এধার থেকে ছুটে ওধার যাই, আবার ওধার থেকে ছুটে এধারে আসি। গায়ের অর্ধেক রক্ত বোধ করি আর নেই মা।

বহু প্রয়াস, বহু সাধ্য-সাধনায় ঘরে আনা বৃদ্ধ গুরুদেবের অবস্থা দেখে নন্দরানীর দু'চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠল, বললেন, কিন্তু বাবা, বাড়িটা যে তেতলা, আপনার ঘরের উপর আরও যে দুটো ঘর আছে, বৃষ্টির জল তিন-তিনটে ছাত ফুঁড়ে নামবে কি করে? কিন্তু বলতে বলতেই তাঁর সহসা মনে হলো এ হয়ত ঐ শয়তান লালুর কোনরকম শয়তানি বুদ্ধি। ছুটে গিয়ে বিছানা হাতড়ে দেখেন মাঝখানে চাদর অনেকখানি ভিজে এবং মশারি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দেখতে পেলেন ন্যাকড়ায় বাঁধা এক চাঙড় বরফ, সবটা গলেনি, তখনও এক টুকরো বাকি আছে। পাগলের মত ছুটে বাহিরে গিয়ে চাকরদের যাকে সুমুখে পেলেন চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন,—হারামজাদা লেলো কোথায়? কাজকর্ম চুলোয় যাক গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন্।

লালুর বাবা সেইমাত্র নীচে নামছিলেন, স্ত্রীর কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন,—কি কাণ্ড করচ? হলো কি?

নন্দরানী কেঁদে ফেলে বললেন, হয় তোমার ঐ লেলোকে বাড়ি থেকে তাড়াও, না হয় আজই আমি গঙ্গায় ডুবে এ-মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করব।

কি করলে সে?

বিনা দোষে গুরুদেবের দশা কি করেছে চোখে দেখোগে। তখন সবাই গেলেন ঘরে। নন্দরানী সব বললেন, সব দেখালেন। স্বামীকে বললেন, এ দস্যি ছেলেকে নিয়ে ঘর করব কি করে তুমি বল?

গুরুদেব ব্যাপারটা সমস্ত বুঝলেন। নিজের নির্বুদ্ধিতায় বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করে হেসে ফেললেন।

লালুর বাবা আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাকররা এসে বললে, লালুবাবু কোঠি মে নহি হ্যায়। আর একজন এসে জানালে সে মাসীমার বাড়িতে বসে খাবার খাচ্ছে। মাসীমা তাকে আসতে দিলেন না।

মাসিমা মানে নন্দর ছোট বোন। তার স্বামীও উকিল, সে অন্য পাড়ায় থাকে।
এর পরে লালু দিন-পনেরো আর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দিলে না।

লালু ২

তার ডাকনাম ছিল লালু। ভাল নাম অবশ্য একটা ছিলই, কিন্তু মনে নেই। জানো বোধ হয়, হিন্দীতে ‘লাল’ শব্দটার অর্থ হচ্ছে—প্রিয়। এ-নাম কে তারে দিয়েছিল জানিনে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নামের এমন সঙ্গতি কদাচিৎ মেলে। সে ছিল সকলের প্রিয়।

ইস্কুল ছেড়ে আমরা গিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম, লালু বললে, সে ব্যবসা করবে। মায়ের কাছে দশ টাকা চেয়ে নিয়ে সে ঠিকেদারি শুরু করে দিলে। আমরা বললাম, লালু, তোমার পুঁজি ত দশ টাকা। সে হেসে বললে, আর কত চাই, এই ত ঢের।

সবাই তাকে ভালবাসতো, তার কাজ জুটে গেল। তার পরে কলেজের পথে প্রায়ই দেখতে পেতাম, লালু ছাতি মাথায় জনকয়েক কুলি-মজুর নিয়ে রাস্তার ছোটখাটো মেরামতির কাজে লেগেছে। আমাদের দেখে হেসে তামাশা করে বলতো,—যা যা দৌড়ো—পারসেন্টেজের খাতায় এখুনি ঢ্যারা পড়ে যাবে।

আরও ছোটকালে যখন আমরা বাংলা ইস্কুলে পড়তাম, তখন সে ছিল সকলের মিস্ত্রী। তার বইয়ের থলির মধ্যে সর্বদাই মজুত থাকত একটা হামানদিস্তার ডাঁটি, একটা নরুণ, একটা ভাঙ্গা ছুরি, ফুটো করবার একটা পুরোনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল,– কি জানি কোথা থেকে সে এ-সব সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু এ দিয়ে পারতো না সে এমন কাজ নেই। ইস্কুল-সুদ্ধ সকলের ভাঙ্গা ছাতি সারানো, শ্লেটের ফ্রেম আঁটা, খেলতে ছিঁড়ে গেলে তখনি জামা-কাপড় সেলাই করে দেওয়া–এমন কত কি। কোন কাজে কখনো না বলতো না। আর করতোও চমৎকার। একবার 'ছট্' পরবের দিনে কয়েক পয়সার রঙ্গিন কাগজ আর শোলা কিনে কি একটা নতুন তৈরি করে সে গঙ্গার ঘাটে বসে প্রায় আড়াই টাকার খেলনা বিক্রি করে ফেললে। তার থেকে আমাদের পেটভরে চিনেবাদাম-ভাজা খাইয়ে দিলে।

বছরের পরে বছর যায়, সকলে বড় হয়ে উঠলাম। জিমনাস্টিকের আখড়ায় লালুর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তার গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, সাহস ছিল তেমনি অপরিসীম। ভয় কারে কয় সে বোধ করি জানতো না। সকলের ডাকেই সে প্রস্তুত, সবার বিপদেই সে সকলের আগে এসে উপস্থিত।

কেবল তার একটা মারাত্মক দোষ ছিল, কাউকে ভয় দেখাবার সুযোগ পেলে সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারতো না। এতে ছেলে-বুড়ো-গুরুজন সবাই তার কাছে সমান। আমরা কেউ ভেবে পেতাম না, ভয় দেখাবার এমন সব অদ্ভুত ফন্দি তার মাথায় একনিমিষে কোথা থেকে আসে! দু'-একটা ঘটনা বলি। পাড়ার মনোহর চাটুজ্জের বাড়ি কালীপূজো। দুপুর-রাতে বলির ক্ষণ বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটলো ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সংবাদ দিতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো,–উপায়? এত রাত্রে ঘাতক মিলবে কোথায়? দেবীর পূজো পণ্ড হয়ে যায় যে! কে একজন বললে, পাঁঠা কাটতে পারে লালু। এমন অনেক সে কেটেছে। লোক দৌড়ল তার কাছে, লালু ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলো, বললে–না।

না কি গো? দেবীর পূজোয় ব্যাঘাত ঘটলে সর্বনাশ হবে যে!

লালু বললে, হয় হোক গে। ছোটবেলায় ও-কাজ করেছি, কিন্তু এখন আর করব না।

যারা ডাকতে এসেছিল তারা মাথা কুটতে লাগলো, আর দশ-পনরো মিনিট মাত্র সময়, তার পরে সব নষ্ট, সব শেষ। তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না। লালুর বাবা এসে আদেশ দিলেন যেতে। বললেন, ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন,–না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও। সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য লালুর নেই।

লালুকে দেখে চাটুজ্জে মশায়ের ভাবনা ঘুচলো। সময় নেই,–তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিঁদুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো, বাড়িসুদ্ধ সকলের 'মা' 'মা' রবের প্রচণ্ড চিৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল, লালুর হাতের খড়গ নিমিষে ঊর্ধ্বোত্থিত হয়েই সজোরে নামলো, তার পরে বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তের ফোয়ারা কালো মাটি রাঙ্গা করে দিলে। লালু ক্ষণকাল চোখ বুজে রইল। ক্রমশঃ ঢাক ঢোল কাঁসির সংমিশ্রণে বলির বিরাট বাজনা থেমে এলো। যে পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আবার তার কপালে চড়লো সিঁদুর, গলায় দুললো রাঙ্গা মালা, আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ঙ্কর অন্তিম আবেদন, সেই বহুকণ্ঠের সম্মিলিত 'মা' 'মা' ধ্বনি। আবার লালুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নীচে নেমে এলো,–পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহটা ভূমিতলে বার-কয়েক হাত-পা আছড়ে কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হ'লো; তার কাটা-গলার রক্তধারা রাঙ্গামাটি আরও খানিকটা রাঙ্গিয়ে দিলে।

ঢুলিরা উন্মাদের মতো ঢোল বাজাচ্ছে, উঠানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে বহু লোকের বহু প্রকারের কোলাহল; সুমুখের বারান্দায় কার্পেটের আসনে বসে মনোহর চাটুজ্জে মুদ্রিতনেত্রে ইষ্টনাম জপে রত, অকস্মাৎ লালু ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। সমস্ত

শব্দ-সাড়া গেল থেমে—সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ—এ আবার কি! লালুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখের তারা দুটো যেন ঘুরছে, চেঁচিয়ে বললে, আর পাঁঠা কৈ?

বাড়ির কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আর ত পাঁঠা নেই। আমাদের শুধু দু'টো করেই বলি হয়।

লালু তার হাতের রক্তমাখা খাঁড়াটা মাথার উপরে বার-দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশকণ্ঠে গর্জন করে উঠলো—নেই পাঁঠা? সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে—দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাবো ধরে নরবলি দেব—মা মা—জয়-কালী! বলেই একটা মস্ত লাফ দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিক গিয়ে পড়লো, তার হাড়ের খাঁড়া তখন বনবন করে ঘুরচে। তখন যে কাণ্ড ঘটলো ভাষায় বর্ণনা করে যায় না। সবাই একসঙ্গে ছুটলো সদর দরজার দিকে, পাছে লালু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োমুড়িতে সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কেউ পড়েছে গড়িয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে কারও পায়ের ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে বেরোবার চেষ্টা করচে, কারও গলা কারও বগলের চাপের মধ্যে পড়ে দম আটকাবার মত হয়েছে, একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাবার চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে,—কিন্তু এ-সব মাত্র মুহূর্তের জন্যে। তার পরেই সমস্ত ফাঁকা।

লালু গর্জে উঠলো—মনোহর চাটুজ্জে কৈ? পুরুত গেল কোথায়?

পুরুত রোগা লোক, সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। গুরুদেব কুশাসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে ঠাকুর-দালানের একটা মোটা থামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়েচেন। কিন্তু, বিপুলায়তন দেহ নিয়ে মনোহরের পক্ষে ছুটাছুটি করা কঠিন। লালু এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে তাঁর একটা হাত চেপে ধরলে, বললে, চলো হাড়িকাঠে গিয়ে গলা দেবে।

একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজ্জের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদো-কাঁদো গলায় মিনতি করতে লাগলেন, লালু! স্থির হয়ে চেয়ে দেখ—আমি পাঁঠা নই, মানুষ। আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাবা, তোমার বাবা আমার ছোট ভাইয়ের মত।

সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে—চলো তোমাকে বলি দেব! মায়ের আদেশ!

চাটুজ্জে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—না বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কখ্‌খনো নয়—মা যে জগজ্জননী!

লালু বললে—জগজ্জননী! সে জ্ঞান আছে তোমার? আর দেবে পাঁঠা-বলি? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে? বলো।

চাটুজ্জে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কোনদিন নয় বাবা, আর কোনদিন নয়, মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করচি, আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ।

ঠিক ত?

ঠিক বাবা ঠিক। আর কখনো না। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাব।

লালু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পুরুত পালালো কোথা দিয়ে? গুরুদেব? সে কৈ? এই বলে সে পুনশ্চ একটা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুরদালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন গলার ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠলো। সরু ও মোটায় মিলিয়ে সে শব্দ এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর যে, লালু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। হাঃ হাঃ হাঃ—করে হেসে উঠে দুম্‌ করে মাটিতে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো।

তখন কারো বুঝতে বাকী রইল না খুন-চাপা-টাপা সব মিথ্যে, সব তার চালাকি। লালু শয়তানি করে এতক্ষণ সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল ফিরে এসে জুটলো। ঠাকুরের পূজো তখনো বাকী, তাতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটেছে এবং মহা হৈচৈ কলরবের মধ্যে চাটুজ্জে মশাই সকলের সম্মুখে বার বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন—ঐ বজ্জাত ছোঁড়াটাকে যদি না কাল সকালেই ওর বাপকে দিয়ে পঞ্চাশ ঘা জুতো খাওয়াই ত আমার নামই মনোহর চাটুজ্জে নয়।

কিন্তু জুতো তাকে খেতে হয়নি। ভোরে উঠেই সে যে কোথায় পালালো, সাত-আটদিন কেউ তার খোঁজ পেলে না। দিন-সাতেক পরে একদিন অন্ধকারে লুকিয়ে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে ঢুকে তাঁর ক্ষমা এবং পায়ের ধুলো নিয়ে সে-যাত্রা বাপের ক্রোধ থেকে নিস্তার পেলে। কিন্তু সে যাই হোক, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজ্জেবাড়ির কালীপূজায় তখন থেকে পাঁঠাবলি উঠে গেল।

লালু ৩

আমাদের শহরে তখন শীত পড়েছে, হঠাৎ কলেরা দেখা দিলে। তখনকার দিনে ওলাউঠার নামে মানুষে ভয়ে হতজ্ঞান হতো। কারও কলেরা হয়েছে শুনতে পেলে সে-পাড়ায় মানুষ থাকতো না। মারা গেলে দাহ করার লোক মেলা দুর্ঘট হতো। কিন্তু সে দুর্দিনেও আমাদের ওখানে একজন ছিলেন যাঁর কখনো আপত্তি ছিল না। গোপালখুড়ো তাঁর নাম, জীবনের ব্রত ছিল মড়া-পোড়ানো। কারও অসুখ শক্ত হয়ে উঠলে তিনি ডাক্তারের কাছে প্রত্যহ সংবাদ নিতেন। আশা নেই শুনলে খালি পায়ে গামছা কাঁধে তিনি ঘণ্টা-দুই পূর্বেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। আমরা জনকয়েক ছিলাম তাঁর চ্যালা। মুখ ভার করে বলে যেতেন,—ওরে, আজ রাত্রিটা একটু সতর্ক থাকিস, ডাকলে যেন সাড়া পাই। রাজদ্বারে শ্মশানে চ—শাস্ত্রবাক্য মনে আছে ত?

আজ্ঞে, আছে বৈ কি। আপনি ডাক দিলেই গামছা সমেত বেরিয়ে পড়ব।

বেশ বেশ, এই ত চাই। এর চেয়ে পুণ্যকর্ম সংসারে নেই।

আমাদের দলের মধ্যে ছিল লালুও একজন। ঠিকেদারির কাজে বাইরে না গেলে সে কখনো না বলত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিষণ্ণমুখে খুড়ো এসে বললেন, বিষ্টু পণ্ডিতের পরিবারটা বুঝি রক্ষে পেলে না।

সবাই চমকে উঠলাম। অতি গরীব বিষ্টু ভট্‌চাযের কাছে বাংলা ইস্কুলে আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। নিজে সে চিররুগ্ন এবং চিরদিন স্ত্রীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল। জগতে আপনার বলতে কেউ নেই,–তার মত নিরীহ অসহায় মানুষ সংসারে আমি দেখিনি।

রাত্রি আন্দাজ আটটা, দড়ির খাটে বিছানা-সমেত পণ্ডিত-গৃহিণীকে আমরা ঘর থেকে উঠানে নামালাম। পণ্ডিতমশাই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। সংসারে কোন-কিছুর সঙ্গে সে চাহনির তুলনা হয় না এবং সে একবার দেখলে সারা জীবনে ভোলা যায় না।

মৃতদেহ তোলবার সময় পণ্ডিতমশাই আস্তে আস্তে বললেন–আমি সঙ্গে না গেলে মুখাগ্নির কি হবে?

কেউ কিছু বলবার আগে লালু বলে উঠল, ও-কাজটা আমি করব, পণ্ডিতমশাই। আপনি আমাদের গুরু, সেই সম্পর্কে উনি আমাদের মা।

আমরা সবাই জানতাম শ্মশানে হেঁটে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বাংলা ইস্কুল মিনিট-পাঁচেকের পথ, হাঁপাতে হাঁপাতে সেটুকু আসতেও তাঁর আধ-ঘণ্টার বেশী সময় লাগতো।

পণ্ডিতমশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, নিয়ে যাবার সময় ওঁর মাথায় একটু সিঁদুর পরিয়ে দিবিনে লালু?

নিশ্চয় দেব, পণ্ডিতমশাই,—নিশ্চয় দেব, বলে এক লাফে সে ঘরে ঢুকে কৌটো বার করে আনলে এবং যত সিঁদুর ছিল সমস্তটা মাথায় ঢেলে দিলে।

'হরিবোল' দিয়ে আমরা গৃহ হতে গৃহিণীর মৃতদেহ চিরদিনের মত বার করে নিয়ে এলাম,—পণ্ডিতমশাই খোলা দোরের চৌকাঠে হাত দিয়ে তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গঙ্গার তীরে শ্মশান অনেক দূর, প্রায় ক্রোশ-তিনেক। সেখানে পৌঁছে যখন আমরা শব নামালাম, তখন রাত দুটো। লালু খাট ছুঁয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসল। কেউ কেউ যেখানে-সেখানে শ্রান্তিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। শুক্লাদ্বাদশীর পরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় বালুময় বহুদূর-বিস্তৃত শ্মশান অত্যন্ত জনহীন। গঙ্গার ওপার থেকে কনকনে উত্তরে হাওয়ার জলে ঢেউ উঠেছে, তার কোন-কোনটা লালুর পায়ের প্রায় নীচে পর্যন্ত আছাড় খেয়ে-খেয়ে পড়ছে। শহর থেকে গরুর গাড়িতে পোড়াবার কাঠ আসে, কি জানি সে কতক্ষণে পৌঁছবে। আধ-ক্রোশ দূরে পথের ধারে ডোমদের বাড়ি; আসার সময়ে আমরা তাদের হাঁক দিয়ে এসেছি, তাদের আসতেই বা না-জানি কত দেরি।

সহসা গঙ্গার ওপারে দিগন্তে একটা গাঢ় কালো মেঘ উঠে প্রবল উত্তরে হাওয়ায় হু হু করে সেটা এপারে ছুটে আসতে লাগল। গোপালখুড়ো সভয়ে বললেন, লক্ষণ ভালো ঠেকচে না রে,—বৃষ্টি হতে পারে। এই শীতে জলে ভিজলে আর রক্ষে থাকবে না।

কাছে আশ্রয় কোথাও নেই,—একটা বড় গাছ পর্যন্ত না। কতকটা দূরে ঠাকুরবাড়ির আমবাগানে মালীদের ঘর আছে বটে, কিন্তু অতখানি ছোটা ত সহজ নয়।

দেখতে দেখতে আকাশ গেল ছেয়ে, চাঁদের আলো ডুবল অন্ধকারে, ওপার থেকে বৃষ্টিধারার সোঁসোঁ শব্দ এলো কানে, ক্রমশঃ সেটা নিকটতর হয়ে উঠল। আগাম দু-দশ ফোঁটা সকলেরই গায়ে এসে পড়ল তীরের মত, কি-করি কি-করি ভাবতে-ভাবতেই মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে এলো। মড়া রইল পড়ে, প্রাণ বাঁচাতে কে যে কোথায় ছুট দিলে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

জল থামলে ঘণ্টা-খানেক পরে একে একে সবাই ফিরে এলাম। মেঘ গেছে কেটে, চাঁদের আলো ফুটেছে দিনের মত। ইতিমধ্যে গরুর গাড়ি এসে পৌঁছেচে, গাড়োয়ান কাঠ এবং শবদাহের অন্যান্য উপকরণ নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার উদ্যোগ করচে। কিন্তু ডোমদের দেখা নেই। গোপালখুড়ো বললেন, ও-ব্যাটারা ঐ রকম। শীতে ঘর থেকে বেরুতে চায় না।

মণি বললে, কিন্তু লালু এখনো ফিরলো না কেন? সে সে বলছিল মুখে আগুন দেবে। ভয়ে বাড়ি পালালো না ত?

খুড়ো লালুর উদ্দেশে রাগ করে বললেন, ওটা ঐ-রকম। যদি এতই ভয়, মড়া ছুঁয়ে বসতে গেলি কেন? আমি হলে বজ্রাঘাত হলেও মড়া ছেড়ে যেতাম না।

ছেড়ে গেলে কি হয় খুড়ো?

কি হয়? কত-কি?শ্মশানভূমি কিনা!

শ্মশানে একলা বসে থাকতে আপনার ভয় করত না?

ভয়! আমার? অন্ততঃ হাজারটা মড়া পুড়িয়েছি জানিস!

এর পরে মণি আর কথা কইতে পারলে না। কারণ সত্যই খুড়োর গর্ব করা সাজে। শ্মশানে গোটা-দুই কোদাল পড়েছিল, খুড়ো তার একটা তুলে নিয়ে বললেন, আমি চুলোটা কেটে ফেলি, তোরা হাতাহাতি করে কাঠগুলো নীচে নামিয়ে ফেল।

খুড়ো চুলি কাটচেন, আমরা কাঠ নামিয়ে আনচি; নরু বললে, আচ্ছা, মড়াটা ফুলে যেন দুগুণ হয়েছে, না?

খুড়ো কোনদিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন, ফুলবে না? লেপ-কাঁথা সব জলে ভিজেছে যে!

কিন্তু তুলো জলে ভিজলে ত চুপসে ছোট হয়ে যাবে খুড়ো, ফুলবে না ত।

খুড়ো রাগ করে উঠলেন,—তোর ভারী বুদ্ধি। যা করচিস্ কর।

কাঠ বহা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

নরুর দৃষ্টি ছিল বরাবর খাটের প্রতি। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে,—খুড়ো, মড়া যেন নড়ে উঠল।

খুড়োর হাতের কাজ শেষ হয়েছিল, কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, তোর মত ভীতু মানুষ আমি কখনো ত দেখিনি নরু! তুই আসিস কেন এ-সব কাজে? যা—বাকী কাঠগুলো আন। আমি চিতাটা সাজিয়ে ফেলি। গাধা কোথাকার!

আবার মিনিট-দুই গেল। এবার মণি হঠাৎ চমকে উঠে পাঁচ-সাত পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে সভয়ে বললে, না খুড়ো, গতিক ভালো ঠেকছে না। সত্যিই মড়াটা যেন নড়ে উঠলো।

খুড়ো এবারে হাঃ হাঃ—করে হেসে বললেন, ছোঁড়ার দল—তোরা ভয় দেখাবি আমাকে? যে হাজারের উপর মড়া পুড়িয়েছে—তাকে?

নরু বললে, ঐ দেখুন আবার নড়চে।

খুড়ো বললেন, হাঁ নড়চে, ভূত হয়ে তোকে খাবে বলে—মুখের কথাটা তাঁর শেষ হলো না, অকস্মাৎ লেপকাঁথা জড়ানো মড়া হাঁটু গেড়ে খাটের উপর বসে ভয়ঙ্কর বিশ্রী খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো,—নাঁ নাঁ—নঁরুকে নাঁ—গোঁপালকেঁ খাঁবো—

ওরে বাবা রে! আমরা সবাই মারলাম ঊর্ধশ্বাসে দৌড়। গোপালখুড়োর সুমুখে ছিল কাঠের স্তূপ, তিনি উপরের দিকে আমাদের পিছনে ছুটতে না পেরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লেন গঙ্গার জলে। সেই কনকনে ঠাণ্ডা একবুক জলে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন—বাবা গো, গেছি গো— ভূতে খেয়ে ফেললে গো!—রাম—রাম—রাম—

এদিকে সেই ভূতও তখন মুখের ঢাকা ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল—ওরে নির্মল, ওরে মণি, ওরে নরু, পালাস নে রে—আমি লালু—ফিরে আয়—ফিরে আয়—লালুর কণ্ঠস্বর আমাদের কানে পৌঁছলো। নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে সবাই ফিরে এলাম। গোপালখুড়ো শীতে কাঁপতে কাঁপতে ডাঙ্গায় উঠলেন। লালু তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে সলজ্জে বললে, সবাই জলের ভয়ে পালাল, কিন্তু আমি মড়া ছেড়ে যেতে পারলাম না, তাই লেপের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম।

খুড়ো বললেন, বেশ করছিলে বাবা, খাসা বুদ্ধি করেছিল। এখন যাও, ভাল করে গঙ্গামাটি মেখে চান করো গে। এমন শয়তান ছেলে আমি আমার জন্মে দেখিনি—

তিনি কিন্তু মনে মনে তাকে ক্ষমা করলেন। বুঝলেন, এতবড় ভয়শূন্যতা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব। এই রাতে একাকী শ্মশানে কলেরার মড়া, কলেরার বিছানা—এ-সব সে গ্রাহ্যই করলে না!

মুখে আগুন দেবার কথায় খুড়ো আপত্তি করলেন, না, সে হবে না। ওর মা শুনতে পেলে আর আমার মুখ দেখবেন না।

শবদাহ সমাধা হলো। আমরা গঙ্গায় স্নান সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন সেইমাত্র সূর্যোদয় হয়েছে।